ছোটদের নদীয়া

(নদীয়ার সংক্ষিপ্ত ভূগোল ও ইতিহাস)

"বাঙ্‌লার শিরোমণি সার্থক নদীয়া
বঙ্গদেশ ধন্য হ'লো এর সুধা পিয়া,
এ জগতে নদীয়ার নাহিক তুলনা
যখন যেখানে থাক এ দেশ ভুলনা ॥"

—শ্রীকৃষ্ণধন দে

'বীর আশানন্দ' ও 'বঙ্গবীর সুরেশ বিশ্বাস' প্রণেতা
শ্রীচণ্ডীচরণ দে
প্রণীত

[illegible] বুক ষ্টল
কলিকাতা।

মূল্য—সাড়ে চারি আনা মাত্র

গত তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি আমার প্রিয় জন্মভূমি পরম পবিত্র পল্লী শান্তিপুরে আমার পরম পূজনীয় শিক্ষক ও 'প্রকৃতির-দুলাল' সুপরিচিত প্রবীন কবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি অর্পণ করি। তিনি তাহা পাঠ করিয়া আমাকে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে উপদেশ দেন। কিন্তু আমি নানা সাংসারিক কারণে ও বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যে এতদিন ইহা প্রকাশ করিতে পারি নাই।

তাহার পর পরম শ্রদ্ধেয় সুবিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এ মহাশয় ছোটদের জন্য লিখিত আমার **'বীর আশানন্দ'**এর সমালোচনা প্রসঙ্গে তৎ সম্পাদিত 'কৈশোরক' মাসিক পত্রিকার এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। —'বাঙ্গালী ছেলেরা নিজেদের দেশের কথা যেমন কম জানে, তেমনি নিজ নিজ দেশের বড় বড় লোকেদের জীবন কথা এবং আপনাদের ঘরের কথাও খুবই কম জানে। প্রত্যেক দেশেই অজেকাল **'Glorious-Heritage'** বা অতীতের সকল প্রকার বীর পুরুষদের কথা গল্পের আকারে এবং ছবির সাহায্যে প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে ছোটদের একটা সত্যিকার জ্ঞান লাভের সুযোগ ঘটে। এইরূপ ব্যবস্থা আমাদের দেশেও হওয়া উচিত।' ইহা পাঠ করিয়া আমি বিশেষ-ভাবে উৎসাহিত হই এবং এই পুস্তক প্রণয়ণে বদ্ধপরিকর হই। আশা করি নদীয়ায় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয়গণের নিকট ইহা আদরনীয় হইবে।

এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আমার বন্ধু সুকবি এবং সবাক্ চিত্রে প্রদর্শিত বহু ছায়া-নাট্যের গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণধন দে এম, এ ও শ্রীসত্যবান মণ্ডল বি, এস-সি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমি অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই পুস্তকে অনেক কিছু ভুল ত্রুটি থাকা সম্ভব। যাঁহার যাহা গোচরে আসে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইলে অবনত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিব এবং সেই দৃষ্টে ভবিষ্যতে ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিব।

বিনীত

'রাম-কুঞ্জ'
৪২ ভবানী পাড়া ষ্ট্রীট
শান্তিপুর, নদীয়া
শুভ রাস-পূর্ণিমা ১৩৪৭

নদীয়ার ভালছেলে বাংলা দেশের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী এবং কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলার মাননীয় খান
বাহাদুর এম, আজিজুল হক, সি-আই-ই মহোদয়।
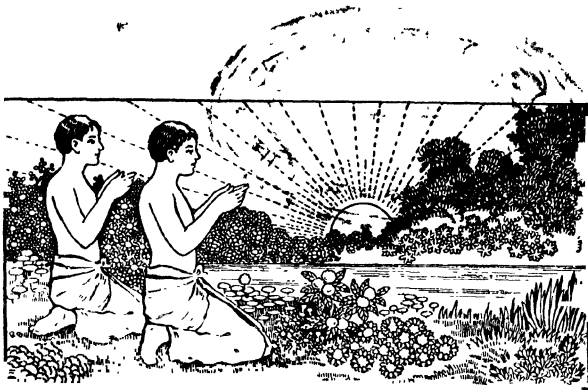
ছোটদের নদীয়া

সোনার নদীয়ার আধ ফুটন্ত ফুলের কুঁড়ির মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, এই বইয়েতে তোমরা তোমাদের নিজেদের জেলার কথা পাঠ করিবে। এই জেলার বিবরণ পাঠ করিতে করিতে তোমাদের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। তোমরা যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, যেখানে বাস করিয়া তোমরা লেখা পড়া শিখিতেছ, সেখানকার সকল কথা তোমাদের ভাল করিয়া জানা উচিত নহে কি? সকল দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শিক্ষার প্রথম হইতেই নিজেদের দেশের কথা পাঠ করে। ইহাতে তাহারা গৌরব অনুভব করে এবং নিজেদের দেশকে ভাল বাসিতে শেখে। নদীয়া জেলা বাংলা দেশে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তোমরা বড় হইয়া ইহার বিষয় আরও যতই জানিবে ততই মুগ্ধ হইবে।

নদীয়া নামের উৎপত্তি

প্রাচীন বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে গঙ্গার মোহনায় নয়টি দ্বীপ ছিল। সম্ভবতঃ ইহা হইতে 'নবদ্বীপের' নাম হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে 'নব' অর্থাৎ 'নূতন' দ্বীপ হইতে 'নবদ্বীপের' নামকরণ হইয়াছিল। কালক্রমে নবদ্বীপ হইতে নদীয়া নামের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। 'নদীয়া' নাম সম্বন্ধে আরও একটি প্রবাদ আছে। পূরাকালে গঙ্গার চড়ে এক সাধু বাস করিতেন। তিনি প্রতিদিন রাত্রিতে নয়টি প্রদীপ জ্বালিয়া পূজা করিতেন। 'ন' অর্থাৎ 'নয়' এবং 'দীয়া' অর্থাৎ 'দীপ' এই দুইটি শব্দ হইতে সেই স্থানটিকে 'নয়-দীয়ার-চড়' বলা হইত। পরে ইহাই নদীয়া নামে পরিণত হইয়াছে। এই নদীয়ায় আগে কত গৌরব ছিল! 'নদীয়া রাজ্য' বলিলে সমগ্র বাংলা দেশকেই বুঝাইত।

নদীয়া জেলার সীমা

নদীয়া জেলা বাংলা দেশের প্রেসিডেন্সী বিভাগের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার—

উত্তরে—পাবনা, রাজসাহী ও মুর্শিদাবাদ জেলা।
পশ্চিমে—বর্দ্ধমান এবং হুগলী জেলা।
দক্ষিণে—চব্বিশ পরগণা জেলা।
পূর্ব্বে—যশোহর ও ফরিদপুর জেলা।

ইহা ভিন্ন গঙ্গানদী নদীয়ার পশ্চিম সীমানা হইয়া আছে। এই নদীর স্রোত পরিবর্ত্তনের জন্য এখন নবদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে অবস্থান করিতেছে। নদীয়া জেলার আয়তন **২৭৯৩ বর্গ-মাইল**।

সাধারণ স্বাস্থ্য

এককালে নদীয়া বাংলার "স্বাস্থ্য-নিবাস" বলিয়া পরিচিত ছিল। আগে এখানে অনেক লোক "হাওয়া বদলাইবার" জন্য আসিতেন। বাংলার তখনকার শাসনকর্ত্তা মাননীয় সার সিসিল বিডন বাহাদুর চিকিৎসকগণের পরামর্শে কিছুকাল নবদ্বীপে বাস করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। এখন তাহার বিপরীত হইয়াছে। চারিদিকেই ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগে দেশ ভরিয়া গিয়াছে।

নদীয়া জেলায় অনেক সরকারী ও বে-সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। উদারপ্রাণ খৃস্টান মিশনারীগণের চেষ্টায় এই জেলায় কয়েকটি স্থানে স্ত্রী ও পুরুষদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে রাণাঘাটের মিশন হাঁসপাতাল বিখ্যাত। ইহার নাম 'দয়া-বাড়ী'র হাঁসপাতাল। কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপে জলের কল হইয়াছে। নদীয়ার সুসন্তান মাননীয় খান বাহাদুর **এম, আজিজুল হক, সি, আই, ই, মহোদয় নদীয়া**

জেলাবোর্ডের তরফ হইতে নদীয়াতে জলকষ্ট নিবারণ ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুব্যবস্থার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান পরিদর্শকের নাম সিভিল-সার্জ্জন। কৃষ্ণনগরে তাঁহার কার্যালয়।

নদীয়ার নদনদী

নদীয়া জেলার মধ্য দিয়া ছোট বড় অনেক নদ-নদী বহিয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে **পদ্মা, গঙ্গা, জলঙ্গী বা খড়িয়া, ভৈরব, মাতাভাঙ্গা, চূর্ণি, ইচ্ছামতী ও গড়ুই** প্রধান। নদীয়ার মধ্যে গঙ্গাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় নদী। দুঃখের বিষয় এই যে বর্ত্তমানে গঙ্গার বেগ কমিয়া ইহা ক্রমে ক্রমে ছোট হইয়া যাইতেছে এবং স্থানে স্থানে ষ্টীমার যাওয়া একপ্রকার বন্ধ হইয়াছে। কোন প্রকারে কলিকাতা হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত ষ্টীমারের চলাচল আছে। নবদ্বীপ হইতে কাঁচড়াপাড়া পর্য্যন্ত গঙ্গা এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। গঙ্গার আর এক নাম 'ভাগীরথী'। নদীয়ায় প্রায় ১৫০টি ছোট বড় বিল ও খাল আছে।

রেল-পথ হইবার পূর্ব্বে এই সকল নদীর অবস্থা অন্যরূপ ছিল। নদীর ধারে 'গঞ্জ'গুলি তখনকার দিনে ব্যবসায়ের একমাত্র কেন্দ্র ছিল। **নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কালীগঞ্জ,**

চাকদহ, কৃষ্ণনগর, স্বরূপগঞ্জ, হাঁসখালি, মুন্সিগঞ্জ, কৃষ্ণগঞ্জ, রাণাঘাট, আলমডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া প্রভৃতি 'গঞ্জ'গুলি খুব বিখ্যাত ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে নদীয়াতে নয় লক্ষ লোক চাষ করিয়া জীবন ধারণ করিত। দিন দিন চাষের অবস্থা নানা প্রকারে খারাপ হইতেছে। চাষীরা অনেকে এখন চাষ ছাড়িয়া দিয়া দেশ-বিদেশে অন্যান্য কাজে মন দিয়াছে। সেই জন্য এখন চাষীর সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই জেলার চাষীরা সকল রকম শস্যদ্রব্য উৎপন্ন করে। এখানকার **সোনামুগ** বিখ্যাত। এই রকম সুস্বাদু ডাল অন্য জেলায় খুব কম পাওয়া যায়। এই জেলায় পাটের চাষ ভালরূপেই হয়। পাটের কারবারে অনেক মহাজন বেশ অর্থ উপার্জ্জন করেন। কয়েক বৎসর হইতে এই জেলার অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে আখের চাষ হইতেছে। তাহা এই জেলার মধ্যে চিনির কলে এবং এই জেলার বাহিরে চালান দেওয়া হইতেছে। এই আখ হইতে যথেষ্ট গুড় ও চিনি তৈয়ারী হয়। নদীয়াতে চিনির ও গুড়ের কারখানা হওয়ায় অনেক লোকের অন্নের যোগাড় হইয়াছে। শান্তিপুরের নিকট সুত্রাগড়ে বিশুদ্ধ প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত হয়। ইহাকে 'দোলো' বলে। পূজা-পার্ব্বণে ইহার

ব্যবহার হয়। সম্প্রতি দর্শনা ও পলাশীর নিকট চিনির কল বসিয়াছে।

এককালে নদীয়ার বিখ্যাত পল্লী শান্তিপুরের সরু কাপড়, মসলীন প্রভৃতি সমগ্র জগতে আদর পাইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখান হইতে প্রতি বৎসর দুই কোটী টাকার উপর নানাপ্রকার কাপড় কিনিয়া বিদেশে চালান দিত। সেই সময় শান্তিপুর কত বড় ব্যবসার স্থান ছিল তাহা তোমরা ভাবিয়া দেখ। এখন চারিদিকে কাপড়ের কল হওয়ায় তাঁতের কাপড়ের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া গিয়াছে। এখনও শান্তিপুরে দুই হাজারের উপর তাঁত আছে। তাহার মধ্যে "জ্যাকর্ডের তাঁত" বেশী। **"শান্তিপুরের শাড়ী"** মেয়েদের অতি প্রিয় বস্ত্র।

তোমরা বোধ হয় **"মোহিনী মিলের"** নাম শুনিয়াছ এবং সেই কলের কাপড় পরিয়াছ বা দেখিয়াছ। তাহা কোথায় জান কি? এই কারখানা কুষ্টিয়াতে আছে। এখানে বহু লোক প্রত্যহ কাজ করে।

নবদ্বীপ, মুড়াগাছা ও মেহেরপুরে পিতল ও কাঁসার বাসন প্রস্তুত হয়। কৃষ্ণনগরে ও ঘুর্ণিতে মাটী দিয়া নানা প্রকারের দেব-দেবীর মুর্ত্তি, পুতুল ও ফল তৈয়ারী হয়। সেগুলি এতই সুন্দর যে তাহা দেখিলে না কিনিয়া থাকা যায় না। নদীয়া জেলার এই স্থানগুলি

ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত :—**নবদ্বীপ, কুষ্টিয়া, রাণাঘাট, চুয়াডাঙ্গা, শান্তিপুর, কুমারখালি, দামুকদিয়া, চাকদহ, কালীগঞ্জ, তেহট্টা, কিষণগঞ্জ এবং আলমডাঙ্গা।**

শাসন প্রণালী

নদীয়া জেলা পাঁচটি মহকুমায় বিভক্ত। যথা—

১। **কৃষ্ণনগর—সদর।**

২। **রাণাঘাট।**

৩। **কুষ্টিয়া।**

৪। **মেহেরপুর।**

৫। **চুয়াডাঙ্গা।**

কৃষ্ণনগর এই জেলার সদর। সদরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্, জেলা জজ, পুলিসের বড় সাহেব প্রভৃতি সদরওয়ালাগণ থাকেন। তাঁহারা এখান হইতে জেলার সমস্ত রাজকার্য্য চালান। প্রয়োজনমত তাঁহারা সময় সময় জেলার মধ্যে সফরে যান। কৃষ্ণনগরে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ও জেলার জজের আদালত আছে। তাঁহারা সেখানে বিচার করেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে রাজকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য সদরে কয়েকজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও সাবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ থাকেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেক মহকুমায় একজন মহকুমা হাকিম থাকেন। জেলার শান্তিরক্ষার

ভার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের অধীনে পুলিসের বড় সাহেবের উপর। পুলিস সাহেবের অধীনে সমগ্র জেলায় পঁচিশটি থানা আছে।

কৃষ্ণনগর মহকুমায়—(১) কৃষ্ণনগর (২) কৃষ্ণগঞ্জ, (৩) নাকাশীপাড়া, (৪) কালীগঞ্জ, (৫) নবদ্বীপ, (৬) হাসখালি ও (৭) চাপ্ড়া।

রাণাঘাট মহকুমায়—(৮) রাণাঘাট, (৯) শান্তিপুর, (১০) চাকদহ এবং (১১) হরিণঘাটা।

কুষ্টিয়া মহকুমায়—(১২) কুষ্টিয়া, (১৩) খোক্সা, (১৪) ভেড়ামারা, (১৫) কুমারখালি, (১৬) মীরপুর (১৭) দৌলতপুর।

চুয়াডাঙ্গা মহকুমায়—(১৮) চুয়াডাঙ্গা, (১৯) দামুড়্হুদা, (২০) আলমডাঙ্গা, (২১) জীবননগর।

মেহেরপুর মহকুমায়—(২২) মেহেরপুর, (২৩) তেহট্ট, (২৪) গাঙ্গনি (২৫) করিমপুর।

এই সকল থানায় পুলিস আছে। প্রত্যেকটি থানার অধীনে দূর পল্লীতে চৌকিদারের ব্যবস্থা আছে। এই সকল চৌকিদারগণ গ্রামের খবর লইয়া সপ্তাহে সপ্তাহে থানায় আসে।

মিউনিসিপ্যালিটী

নদীয়া জেলায় ৯টি মিউনিসিপ্যালিটী আছে।

কৃষ্ণনগর	—স্থাপিত—	১৮৬৪	খৃষ্টাব্দ
রাণাঘাট	”	১৮৬৪	”
শান্তিপুর	”	১৮৬৫	”
নবদ্বীপ	”	১৮৬৯	”
কুষ্টিয়া	”	১৮৬৯	”
মেহেরপুর	”	১৮৬৯	”
কুমারখালি	”	১৮৬৯	”
বীরনগর	”	১৮৬৯	”
চাকদহ	”	১৮৮৬	”

মিউনিসিপ্যালিটী আমাদের হইয়া কি কাজ করে তাহা তোমরা জান কি? ইহা সহরের রাস্তা-ঘাট প্রস্তুত, মেরামত ও পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা এবং রাস্তার দুই পার্শ্বে জল চলাচলের জন্য নালী কাটা, পথে জল দেওয়ার ব্যবস্থা, অন্ধকার রাত্রিতে পথে আলো দেওয়ার ব্যবস্থা, পায়খানা পরিষ্কার, সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা এবং আরও অনেক কল্যাণকর কার্য্য করিয়া থাকে। সকল মিউনিসিপ্যালিটীতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লেখা পড়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। মিউনিসিপ্যালিটীগুলি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তাহাদের সাধারণ আয়ের $\frac{১}{১০}$ অংশ ব্যয় করিতে বাধ্য। অনেক মিউনিসিপ্যালিটী স্বেচ্ছায় ইহা

অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয় করিয়া থাকে। কতকগুলি মিউনিসিপ্যালিটীতে সম্প্রতি অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে

যেখানে মিউনিসিপ্যালিটা নাই অর্থাৎ গ্রাম্য অঞ্চলে জেলা বোর্ডের অধীনে 'ইউনিয়ান বোড' সকল কাজ করে।

রেলপথ ও ডাকঘর

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ছোটলাট সার্ সিসিল বিডন মহোদয়ের আমলে কলিকাতা হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত রেলপথ তৈয়ার হয়। কলিকাতা হইতে ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের লালগোলা, গোয়ালন্দ ও শিলিগুড়ি (দার্জিলিং যাইবার জন্য) লাইন নদীয়ার মধ্য দিয়া গিয়াছে।

নদীয়ার রেলপথ-

কাঁচড়াপাড়া হইতে মাচপাড়া ... ৯৮ মাইল
রাণাঘাট হইতে পলাসী ... ৪৮ মাইল
রাণাঘাট হইতে মাঝের গ্রাম ... ৯ মাইল
শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপ ঘাট (ছোট লাইন) ১৭ মাইল
রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর ... ১২ মাইল
পোড়াদহ হইতে রাইটা ... ২১ মাইল

কৃষ্ণনগর সিটি হইতে নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত ছোট লাইন গিয়াছে। এইখানে গঙ্গা পার হইলেই নদীয়ার পবিত্র এবং

বিখ্যাত স্থান নবদ্বীপ। এখানে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের একটি ষ্টেশন আছে। তাহার নাম **নবদ্বীপধাম**। রাণাঘাট ষ্টেশনটি সব চেয়ে বড়।

এই জেলায় ১৬৩টী **ডাকঘর** আছে। সকল ডাকঘরে টেলিগ্রাফ আফিস নাই। এই সকল ডাকঘর (Post office) যে কত প্রয়োজনীয় তাহা তোমরা বড় হইলে বুঝিতে পারিবে।

প্রধান রাস্তা

কলিকাতা হইতে মোটরে বা সাইকেলে বাহির হইয়া এই জেলার প্রায় সকল স্থানে যাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে কাঁচড়াপাড়ার মধ্য দিয়া এখন যে রাস্তা আছে তাহা ভালরূপে পাকা করিয়া তৈয়ারী হইতেছে। এই রাস্তা পরে অনেকদূর যাইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই জেলার এই রাস্তাগুলি ভাল এবং বিখ্যাত :-

মেহেরপুর হইতে কালীগঞ্জ	...	**২৯ মাইল**
কৃষ্ণনগর হইতে পলাসী	..	**২৮ মাইল**
কৃষ্ণনগর হইতে মেহেরপুর	...	**২৫ মাইল**
নিশ্চিন্তপুর হইতে হাটবোয়ালিয়া	...	**২৩ মাইল**
মেহেরপুর হইতে রামনগর রেল ষ্টেশন		**২১ মাইল**
চুয়াডাঙ্গা হইতে মেহেরপুর	...	**১৮ মাইল**
ভেড়ামাড়া হইতে শিকারপুর	...	**১৬ মাইল**

চাপড়া হইতে তেহাট্টা	...	১৪ মাইল
কৃষ্ণনগর হইতে শিবনিবাস	...	১৪ মাইল
কৃষ্ণনগর হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	...	১২ মাইল
চুয়াডাঙ্গা হইতে ঝিনাইদহ	...	১০ মাইল
বগুলা হইতে কৃষ্ণনগর	...	৯ মাইল
কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর	...	৯ মাইল
রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর	...	৮ মাইল

প্রসিদ্ধ স্থান

নবদ্বীপ—নদীয়া জেলার প্রধান স্থান। ইহা ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে সেন রাজাদের কর্ত্তৃক স্থাপিত। নবদ্বীপের গঙ্গার পূর্ব্বদিকে বামুনপুকুর নামে একটি পল্লীগ্রাম আছে। সেখানে রাজা বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও বড় পুকুরের চিহ্ন স্বরূপ **"বল্লালঢিবি" ও "বল্লাল দীঘি"** এখনও বর্ত্তমান। নবদ্বীপ বাংলা দেশে হিন্দুরাজত্বের শেষ রাজধানী। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী নবদ্বীপ জয় করিয়া মুসলমান রাজত্ব স্থাপন করেন। নবদ্বীপ একদিন সমস্ত ভারতবর্ষে জ্ঞানের আলোক দান করিয়াছিল। নবদ্বীপ-গৌরব শ্রীচৈতন্যদেব এখানে ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নামে তোমাদের নদীয়া চির-কালের জন্য গৌরবময় হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বে নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল। সমগ্র ভারতের ও

ভারতের বাহিরের বহু পণ্ডিত এখানে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আসিতেন। এখনও এখানে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত টোল ও সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে।
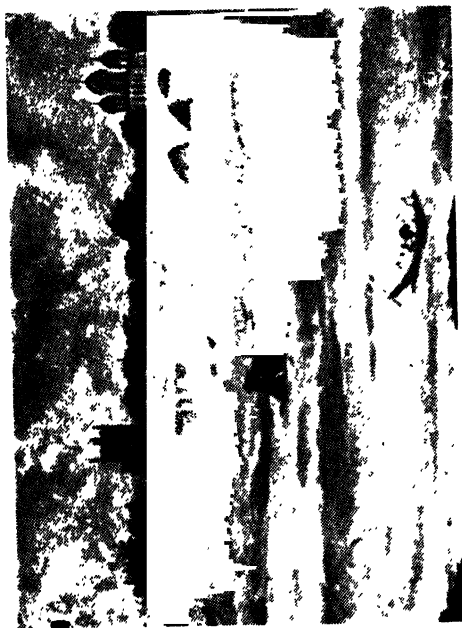
নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাট

দশম শতাব্দীর শেষভাগে সেন বংশের রাজারা এখানে রাজত্ব করিতেন। নবদ্বীপের ৪ মাইল পূর্ব্বে স্থবর্ণ বিহার ও দে পাড়া অঞ্চলে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। এখনও পর্য্যন্ত তাহার চারিদিকে বড় বড় ভাঙা বাড়ী দেখিতে

পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন যে ইহাই আগেকার

মায়াপুরের মন্দির

(ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্ রেলওয়ের প্রচার বিভাগের সৌজন্যে)

রাজাদের শেষ চিহ্ন। হাওড়া হইতে ই, আই, রেলের কাটোয়া লাইনে **নবদ্বীপধাম** ষ্টেশন ৬৬ মাইল।

নবদ্বীপের দ্রষ্টব্যঃ— সোনার গৌরাঙ্গের বাড়ী, মণিপুরের রাজা ও রাণীর ঠাকুর বাড়ী, শ্রীবাস অঙ্গণ, সমাজ বাড়ী, মাড়োয়ারী কর্ত্তৃক পরিচালিত মেয়েদের কীর্ত্তন করিবার আশ্রম, গঙ্গার ঘাট এবং গঙ্গার পরপারে **মায়াপুর**। কলিকাতার গৌড়ীয় মঠ হইতে কয়েকটি সুদৃশ্য মন্দির এখানে তৈয়ারী হইয়াছে। রাত্রিতে মন্দিরের উপর বিদ্যুতের আলো জ্বলে এবং তাহা দেখিতে বড়ই মনোরম। এই স্থানটি একটি ছোট গ্রামে পরিণত হইয়াছে। এখানে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় মঠ কর্ত্তৃক হইয়াছে। তোমরা সময় পাইলেই নবদ্বীপ ও মায়াপুর দেখিও।

শান্তিপুর—আয়তনে এবং লোকসংখ্যায় নদীয়া জেলার মধ্যে সব চেয়ে বড় সহর। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০০০। পরম ভক্ত শ্রীচৈতন্যের সময় ভক্তবীর অদ্বৈতাচার্য্য এখানে বাস করিতেন। তিনি এত বড় সাধু ছিলেন যে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন। সোনার নদীয়ার গৌররমণি এই দুই ভক্তের মিলনে এই স্থান চিরদিনের জন্য তীর্থ হইয়া আছে। শান্তিপুরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে বাব্‌লা গ্রামে শ্রীঅদ্বৈতের সাধন স্থান ছিল। এখানে ঠাকুর বাড়ীর সাম্‌নে নাট-মন্দির এবং তাহার পাশে অতিথি শালা প্রভৃতি তৈয়ারী করা হইয়াছে। আম্র-কুঞ্জের এই নির্জ্জন স্থানটি বড়ই রমণীয়।

প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে তাঁতের সরকারী কারখানা ছিল। জেলাবোর্ড দ্বারা চালিত এখানে একটি বয়নবিদ্যালয় আছে। শান্তিপুরের কাপড় এখনও খুবই বিখ্যাত। এখানে অনেক পুরাতন ও নূতন মন্দির ও মস্‌জিদ্ আছে। তাহাদের মধ্যে শ্যামচাঁদের ও জলেশ্বরের মন্দির এবং এয়ার মহম্মদের মসজিদ্ বিখ্যাত। এই সুদৃশ্য মস্‌জিদ্‌টি ঔরংজীব বাদসাহের সময়ে সেনাপতি এয়ার মহম্মদের দ্বারা তৈয়ারী হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে শান্তিপুর ৫৮ মাইল। এখানকার পানতুয়া, কাঁচাগোল্লা, নিকুতি ও খাসাগোয়া বিখ্যাত। শান্তিপুরে বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদের প্রধান কার্য্যালয়। এখানে বঙ্গবীর আশানন্দ মুখোপাধ্যায় (ঢেঁকি) মহাশয়ের বাড়ী ছিল। তাঁহার বীরত্বপূর্ণ জীবনকথা পড়িলে অবাক্ হইবে। গ্রন্থকার লিখিত **"বীর আশানন্দ"** বইখানি পড়িলে তোমরা তাঁহার বিষয় অনেক জানিতে পারিবে। এখানে তাঁহার ঠাকুর বাড়ীর পার্শ্বে এক সুদৃশ্য স্মৃতি-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এবং তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের রাজধানী। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে গদীতে বসিয়াছিলেন। ৭০ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। তিনি "অগ্নিহোত্র" ও "বাজপেয়ী" নামে দুইটি যজ্ঞ করেন। তাহাতে ২০ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল। এই উপলক্ষে বহু দেশ হইতে বিখ্যাত পণ্ডিতগণ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের

প্রত্যেককে বহুমূল্য উপহার দেওয়া হইয়াছিল। লর্ড ক্লাইভ তাঁহাকে "রাজেন্দ্র বাহাদুর" উপাধি এবং বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধে ব্যবহৃত ১২টি কামান উপহার দিয়াছিলেন। এই কামানগুলি কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে এখনও সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

নানা সৎগুণের জন্য মহারাজার নাম নদীয়াবাসিগণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি বিদ্বান ও দাতা ছিলেন। তিনি নদীয়া জেলার বহুস্থানে জনহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি গুণীর আদর করিতেন। তাঁহার রাজসভায় অনেক গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সুগায়ক ও ভক্ত রামপ্রসাদ সেন, কবি ভারতচন্দ্র, এবং "হাসির জাহাজ" গোগাল ভাঁড় অন্যতম। গোপাল ভাঁড়ের এমন ক্ষমতা ছিল যে তিনি একই সময়ে হাসাইতে ও কাঁদাইতে পারিতেন। তাঁহার মজার গল্পগুলি পড়িলে বা শুনিলে না হাসিয়া থাকিতে পারা যায় না। কৃষ্ণনগর জলাঙ্গী (খড়ে) নদীর ধারে অবস্থিত। কৃষ্ণনগরের এক দিককে গোয়াড়ী বলে। এখান হইতে কলিকাতা রেলে ৬২ মাইল মাত্র।

কৃষ্ণনগরের দ্রষ্টব্যঃ—কলেজের বাড়ী, রাজ প্রাসাদ, রাজার ঠাকুর দালান, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ৺মনমোহন ঘোষের বাড়ী, (এখন এই বাড়ীতে সরকারী স্কুল হইয়াছে) জেলখানা এবং আদালতের বাড়ীগুলি। কৃষ্ণনগরের কাছে ঘূর্ণি নামক স্থানে

বিখ্যাত মৃৎ শিল্পীগণের বাস। তাহাদের হাতের তৈয়ারী নানা প্রকার মূর্ত্তি ও ফল দেখিলে তাক লাগিয়া যায়। ফলগুলি যে কৃত্রিম ইহা মনেই হয় না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন ওস্তাদ যে কোনও লোককে সামনে বসাইয়া ব তাহার ফটো দেখিয়া তাহার মূর্ত্তি করিয়া দিতে পারেন। এখানকার .২ একজন শিল্পী ইউরোপে গিয়া বিশেষ নাম করিয়া আসিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে **শ্রীগোপেশ্বর পাল** অন্যতম। কৃষ্ণনগরের খাবার সরপুরিয়া ও সরভাজা বড়ই উপাদেয় ও বিখ্যাত।

রাণাঘাট—একটি মহকুমা সদর। এখানে মহকুমা হাকিম ও মুনসেফের আদালত আছে। কলিকাতা হইতে ৪৬ মাইল দূরে চুর্ণি নদীর তীরে অবস্থিত। নদীয়া জেলায় রাণাঘাটের মত এতবড় রেলষ্টেশন আর নাই। কলিকাতা হইতে লালগোলা, শিলিগুড়ি (দার্জিলিং যাইবার জন্য) লাইন এখান দিয়া গিয়াছে। এখান হইতে রেলপথে শান্তিপুর এবং যশোহর যাওয়া যায়। এখানকার জমিদার পাল চৌধুরী বাবুরা অনেকদিন হইতে সুবিখ্যাত। তাঁহাদের পুরাতন বৃহৎ অট্টালিকা দেখিবার জিনিস। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার জে, মোনরো কর্ত্তৃক রাণাঘাট "মেডিকেল মিশন" (দাতব্য চিকিৎসালয়) স্থাপিত হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এই মিশন রাণাঘাট হইতে এক মাইল দূরে লইয়া যাওয়া হয়। এখন এখানে মিশনের লোকেরা একটি ছোটখাট গ্রাম

করিয়াছেন। এখানকার ডাক্তারখানার ব্যবস্থা খুব ভাল এবং এখানে অনেক সুচিকিৎসক আছেন। রাণাঘাটের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। দূর পল্লীর অনেকে এখানে নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছেন।

কুষ্টিয়া—গড়ুই নদীর উপরে অবস্থিত। ইহা একটি মহকুমা সদর। এখানে মহকুমা হাকিম ও মুন্সেফের আদালত আছে। নদীয়া জেলার এইস্থান ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। এখানে "**মোহিনী মিল**" নামে একটি বৃহৎ কাপড়ের কল আছে। ইহা ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই কলে এখন খুব ভাল কাপড় তৈয়ারী হয়। কুষ্টিয়ার ছিট ও চাদর বিখ্যাত। এখানে পাটের চাষ বেশী হয়। এইস্থান কলিকাতা হইতে ১০৭ মাইল দূরে।

মেহেরপুর—একটি মহকুমা সদর। এখানে যাওয়া আসার বিশেষ অসুবিধা। এখানে যাইতে হইলে চুয়াডাঙ্গা রেলষ্টেশন হইতে ১৮ মাইল যাইতে হয়। এখানকার কাঁসার বাসন, খাবার রসকদম্ব এবং ক্ষীরের মিঠাই বিখ্যাত। মেহেরপুরের পাশ দিয়া ভৈরব নদ প্রবাহিত।

চুয়াডাঙ্গা—একটি মহকুমা সদর। ইহার পাশ দিয়া মাথাভাঙা নদী গিয়াছে। ইহা পাটের একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র। এই মহকুমার অধিকাংশ লোক কৃষিজীবি এবং

তাহাদের মধ্যে মুসলমানই বেশী। এই স্থান কলিকাতা হইতে ৮৪ মাইল দূরে।

পলাশী—নদীয়ার ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। ইহা কলিকাতা হইতে ৯৩ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দের ২৩শে জুন এইখানে ইংরাজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তখন হইতে ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। এখনও এখানে মাঠে-ঘাটে সেকালের যুদ্ধের গোলাগুলি পাওয়া যায়। এই বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রের আশ-পাশ পল্লীর লোক এখনও গান করে :—

"কি হলোরে জান!
পলাশীর মাঠে নবাব হারাল পরাণ॥
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্ত্তি গায়।
হাঁটু গেড়ে মার্‌ছে তীর মীর মদনের গায়॥
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে বয়ে।
একলা মীর মদন বল কত লবে সয়ে॥"

বামনপুকুর—নবদ্বীপের গঙ্গার ওপারে এই গ্রাম। এখানে হিন্দুরাজাদিগের প্রাসাদ ছিল। এই গ্রামের কিছু অংশ এখন গঙ্গার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। এখানে এখনও একটি উঁচু জায়গা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাকে **"বল্লাল ঢিবি"** বলে এবং ইহার উপর বিখ্যাত হিন্দু রাজা বল্লাল সেনের রাজবাড়ী ছিল বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন।

কাঁচড়াপাড়া—নদীয়া জেলার মধ্যে এই স্থান বর্ত্তমানে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে ঈ, বি, রেলওয়ের খুব বড় কারখানা আছে। এখানে রেলের গাড়ী তৈয়ারী এবং ইঞ্জিন মেরামত হয়। প্রত্যহ বহু লোক এখানে কাজ করে। এই স্থান কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল।

ইহা ভিন্ন এই সকল স্থানগুলিও উল্লেখ যোগ্য :—চাকদহ, আরংঘাটা, শিবনিবাস, মুড়াগাছা, বগুলা, নাকাশী পাড়া, ঘুর্ণি, মহেশগঞ্জ, স্বরূপগঞ্জ, বিল্বপুষ্করিণী, তেহাট্ট, বাগচী-জমসেরপুর, ভাজনঘাট, শীকারপুর, কুমারখালি, দর্শনা, গোঁসাইদূর্গাপুর ও খোক্‌সা।

মেলা ও পর্ব্ব

নদীয়া জেলায় ছোট বড় অনেক মেলা হয়। শান্তি-পুরের রাসমেলা তাহাদের মধ্যে সব চেয়ে বড়। কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে ইহা হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে শান্তিপুরে সকল ঠাকুর বাড়ী ও ঠাকুর বিশেষরূপে সাজান হয় এবং তিন দিন ধরিয়া উৎসব হয়। শেষ দিন ঠাকুর সুসজ্জিত হাওদাতে আলোক মালা শোভিত হইয়া বাহির হন। সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম বাজনা ও সং সহ মিছিল বাহির হয়। ইহাকে "**ভাঙ্গা-রাস**" বলে। এই উপলক্ষে শান্তিপুরে দূর

দেশ হইতে বহু লোক ও নানা জিনিসের দোকান আসে এবং প্রায় এক মাস থাকে। নবদ্বীপে, গোঁসাইদূর্গাপুরে ও মেহেরপুর মহকুমার মধ্যে চাঁদবিল্বগ্রামে রাসযাত্রার মেলা হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমা নদীয়াগৌরব শ্রীচৈতন্য দেবের জন্মদিন।
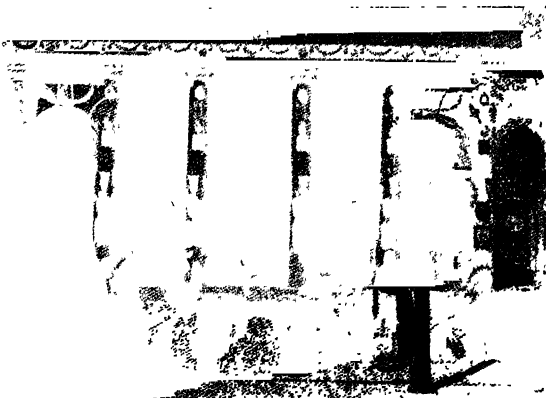
শান্তিপুরে সুসজ্জিত রাস-বাড়ী

এই সময় নবদ্বীপ ও মায়াপুরে বিরাট উৎসব হয়। এই উৎসবে অনেক দূর দেশের বহু শিক্ষিত নর নারী ও ভক্তগণ যোগদান করেন। মাঘ মাসে নবদ্বীপে ধূলোট মেলা হয়। ইহাতে অনেক লোকের বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের আগমন হয়। তাঁহাদের মধুর কীর্ত্তন শ্রবণে সকলে আনন্দ লাভ করেন।

ইহা ভিন্ন নদীয়ার এই সকল স্থানেও মেলা হইয়া থাকে :—

উলা বা বীরনগরে—বৈশাখী পূর্ণিমায় চণ্ডী পূজার মেলা।

তেহাটা গ্রামে—পৌষ সংক্রান্তিতে কৃষ্ণরায়ের মেলা।

ঘোষপাড়ায়—ফাল্গুনী পূর্ণিমার দোলের মেলা।

সুন্দরপুরে—চৈত্র সংক্রান্তিতে তুলসী বিহার মেলা।

মাটীয়ারীতে—আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর মেলা।

আড়ংঘাটাতে—জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যৈষ্ঠ যুগলের মেলা।

কুলিয়া গ্রামে—পৌষ মাসে অপরাধ ভঞ্জনের মেলা।

কৃষ্ণনগরে—চৈত্র মাসে বার-দোলের মেলা।

ইহা ভিন্ন হিন্দু ও মুসলমানের আরও মেলা হয়।

নদীয়া জেলায় "বার মাসে তের পার্ব্বণ" লাগিয়াই আছে। অন্যান্য জেলার অপেক্ষা এখানে দূর্গা ও কালী পূজা বেশী পরিমাণে হয়। শান্তিপুরেই প্রায় ৪০০ কালী পূজা হয়। তাহা ছাড়া কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী ও সরস্বতী পূজা এবং শান্তিপুরের সন্নিকট সুত্রাগড়ে জগদ্ধাত্রী পূজায় বিশেষ ঘটা হয়। মুসলমানদিগের পর্ব্বের মধ্যে মহরম ও ঈদ্ প্রধান। মহরমের সময় বড় বড় "গোয়ারা" বা "তাজিয়া" বাহির হয় এবং তখন লাঠি খেলার নানারূপ কৌশল দেখান হয়।

নদীয়াবাসিগণ

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার প্রথম মানুষ গণনা হয়। তখন এই জেলার লোক সংখ্যা ১৫,০০,৩৯৭ ছিল। সমস্ত জেলায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, গন্ধবণিক প্রভৃতি জাতিরও অন্যান্য জাতির মধ্যে তন্তুবায়, তিলি এবং সদ্‌গোপের বাস বেশী। ইহা ছাড়া, ছুতার, গোয়ালা, প্রভৃতিও বাগ্দী, মুচী, হাড়ি ও নমঃশূদ্রের বাস আছে। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে অনেক বৈষ্ণবের বাস। চুয়াডাঙ্গা, মেহের-পুর ও কুষ্টিয়া মহকুমায় মুসলমানের বাস বেশী। এই জেলায় মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ চাষের কাজ কমই করেন। তাঁহারা চাকুরী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শেষ মানুষ গণনা হইয়াছিল। তখনকার লোক সংখ্যা ছিল ১৫,২৯,৬৩২। তাহার মধ্যে হিন্দু ৫,৭৪,০৪৬ এবং মুসলমান ৯,৪৪,৯১৫।

শিক্ষা

নদীয়া জেলা প্রাচীনকাল হইতে বাংলা দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে সুপরিচিত। একদিন এমন ছিল যখন দূর দেশ হইতে বহু ছাত্র সর্ব্বদাই নবদ্বীপের টোলে নানা বিষয় পড়িতে আসিতেন। নদীয়ার সে গৌরব আর নাই। এক এক জন এক এক বিষয়ে মহা পণ্ডিত ছিলেন।

তাঁহাদের মত সুপণ্ডিত বর্ত্তমানে নাই বলিলেই হয়। সেই সুদূর অতীতের এই সকল পণ্ডিত মহাশয়গণের জন্য নদীয়া চিরদিনের মত গৌরবান্বিত হইয়া আছে।

নদীয়াতে ৩৯টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। বালিকাদের জন্য কয়েকটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইয়াছে।

মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়—	৮৪
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়—	১২৫
নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়—	৬০০
মক্তব—	৪৪৮
জুনিয়ার মাদ্রাসা—	১৪
টোল—	৩৬

নবদ্বীপে এখনও টোলে নানা বিষয় ভালরূপেই পড়ান হয়। সরকারী সাহায্যে এখানে কয়েকটি সংস্কৃত পাঠাগার ও টোল আছে।

খৃষ্টান মিশনারীগণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই জেলার মধ্যে অনেক কাজ করিয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। হাতে-কলমে শিল্প শিখাইবার জন্য চাপরা নামক গ্রামে একটি শিল্প বিদ্যালয় আছে। স্বরূপগঞ্জের দাতা জমিদার ৺বিপ্রদাস পাল চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্যে কৃষ্ণনগরে একটি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগরে একটি সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

তোমরা শুনিয়া আনন্দিত হইবে যে তোমাদের এই নদীয়া জেলা এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষকে জ্ঞান দান করিয়াছিল। তাহা কিরূপে হইয়াছিল তাহা তোমরা বড় হইলে বুঝিতে পারিবে। কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটী প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া এই জেলার শিক্ষা বিস্তারে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছে।

১৮৪৬ সালে ১লা জানুয়ারী কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ খোলা হয়। এই কলেজের সংলগ্ন ১০০ এক শত বিঘা জমি আছে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৬৬,৮৭৬৲ টাকা খরচ করিয়া এই কলেজের বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল। ইহা বাংলা দেশের একটি পুরাতন কলেজ। বাংলা দেশের বহু কৃতী ব্যক্তিগণ এই কলেজের ছাত্র।

হিন্দু রাজত্বকাল

প্রাচীনকালে বর্ত্তমান বাংলার দক্ষিণ ভাগ সমুদ্রের মধ্যে ছিল। ক্রমশঃ গঙ্গা এবং তাহার শাখা নদীগুলি বাহিত পলিমাটীতে এই দক্ষিণভাগ গঠিত হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাংএর বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে গঙ্গার দক্ষিণে নবদ্বীপে 'সমতট' নামে একটি রাজ্য ছিল। বর্ত্তমান নদীয়া সম্ভবতঃ এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ইহা পাল বংশীয় রাজাদের

সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। নবদ্বীপ সহর বোধ হয় পাল বংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা বল্লাল সেন দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। এখনও নবদ্বীপে বল্লাল সেনের রাজ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। বল্লাল সেনের পর মহারাজ লক্ষণ সেন নবদ্বীপে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়া একটি বৃহৎ রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সময় নবদ্বীপের সকল বিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল। বহু প্রসিদ্ধ গুণী পণ্ডিত তাঁহার সভা আলোকিত করিতেন। কেন্দুবিল্বগ্রাম নিবাসী সুবিখ্যাত "গীত গোবিন্দ" প্রণেতা ভক্ত কবি জয়দেব এই গুণীগণের অন্যতম। এই সময় নবদ্বীপ সংস্কৃত চর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকে বলিয়া থাকেন যে লক্ষণ সেনের বৃদ্ধ বয়সে বক্তিয়ার খিলিজী হঠাৎ নবদ্বীপ আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেন পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া যান।

মুসলমান শাসনকাল

বক্তিয়ার খিলিজী নবদ্বীপ অধিকার করার পর ক্রমশঃ বাংলা দেশ দিল্লীর বাদশাহের অধীন হয়। গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের রাজত্বকালে নবদ্বীপের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। হুসেন শাহ নিজে অতি গুণবান্ ছিলেন। তিনি সকল হিন্দু ও মুসলমান প্রজার প্রতি সমান ব্যবহার

করিতেন। রূপ ও সনাতন নামক প্রসিদ্ধ ভক্ত তাঁহার প্রধান সভাসদ্ ছিলেন। সেই সময় শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তখন নদীয়াতে প্রেম-ধর্ম্মের যে বান বহিয়াছিল তাহা "শান্তিপুর ডুবুডুবু ন'দে ভেসে যায়" এই প্রচলিত কথা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। সুবিখ্যাত পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি তখন নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বহু দূর দেশ হইতে অনেক পণ্ডিত তাঁহার নিকট ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষার জন্য আসিতেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে নদীয়া জেলার উত্তর অংশ যশোহরের সুবিখ্যাত বীর রাজা প্রতাপাদিত্যের অধীন ছিল।

প্রতাপাদিত্য বিদ্রোহী হইলে দিল্লীর বাদশাহ আকবর প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য তাঁহার সেনাপতি রাজা মানসিংহকে বাংলা দেশে পাঠান। মানসিংহ নদীয়ার ভবানন্দ মজুমদারের সাহায্যে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করেন। ভবানন্দ মজুমদার তাঁহার সাহায্যের জন্য নদীয়া এবং আরও দশটি পরগণার শাসনভার পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই ভবানন্দ মজুমদারই কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

নদীয়া দিল্লীর বাদশাহের অধীন হইয়াও প্রকৃত পক্ষে ইহা কৃষ্ণনগরের রাজবংশের দ্বারা শাসিত হইত। মহারাজা

কৃষ্ণচন্দ্র ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তখন আলীবর্দ্দী খাঁ বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র নবাব সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেন। রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিসকল তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং ইংরাজদের সাহায্যে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসনচ্যুত করেন। এই রণক্ষেত্রের সেই প্রসিদ্ধ যুদ্ধ স্মরণ রাখিবার জন্য একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হইয়াছে। তোমরা অবসর মত সেই স্থান দেখিয়া আসিও। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যার আদর করিতেন এবং গুণী ব্যক্তিগণের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের সম্মান রক্ষার জন্য নানাপ্রকার সাহায্য করিতেন। সুবিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র এবং ভক্ত গায়ক রামপ্রসাদ তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। তোমরা বড় হইয়া তাঁহাদের জীবন কথা শুনিয়া খুবই আনন্দিত হইবে এবং অনেক কিছু শিখিতে পারিবে।

তখনকার মুসলমান শাসকগণ বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন এবং হিন্দুগণের রচিত গান ও ছড়া প্রভৃতি শ্রবণে অতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ হয়।

ইংরাজ শাসনকাল

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্র ১৭৫২খৃষ্টাব্দে রাজা হন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে নদীয়াতে রাজস্ব আদায়ের জন্য মিঃ এফ, রেডফিয়ার্ণ প্রথম কলেক্টর নিযুক্ত হন। রাজা শিবচন্দ্রের সময় নদীয়া জেলা স্থাপিত হয়। এই শাসন পরিবর্ত্তনের সময় নদীয়া জেলার নানারূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। ১৭৬৮।৬৯ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টির ফলে এই জেলায় শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। এই জন্য এখানে ভীষণ ভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইহার ফলে এখানকার বহু লোক এবং বহু গৃহপালিত পশু মারা গিয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষ বাংলা ১১৭৬ সালে হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে **"ছিয়াত্তরে মন্বন্তর"** বলে।

লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের শাসন ভার গ্রহণ করেন। তিনি দেশের উন্নতির জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে নদীয়াতে নানারূপ অরাজকতার সৃষ্টি হয়। তীতুমীর নামক এক প্রতাপশালী অত্যাচারী নদীয়া জেলার বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়াছিল। তাহার দলে বহু লোক ছিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সৈন্যগণ তীতুমীরের কেল্লা ঘিরিয়া ফেলেন। কেল্লার মধ্যে তীতুমীর সদলে প্রাণত্যাগ করে।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার নীলকরগণের সহিত

চাষীদের বিবাদ হইয়াছিল। ইহার ফলে দেশের মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট বিশেষ-রূপে চেষ্টা করিয়া নীলকর গণের অত্যাচার দমন করেন। তোমরা বড় হইয়া নদীয়ার বিখ্যাত লেখক ৺দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" বইখানি পড়িলে নীল-করদের বিষয় জানিতে পারিবে। স্যার সি,সিল বিডন যখন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তখন নদীয়া জেলায় এক প্রকার রোগ দেখা দেয় যাহা ক্রমে ক্রমে মহামারীর রূপ ধারণ করিয়া কোনও কোনও গ্রাম একেবারে জনশূন্য করিয়া দিয়াছিল। ইহাতে নদীয়ার কোন কোন স্থান শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। এই রোগেই বিখ্যাত বীরনগর বা উলা ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। এই শাসন কর্ত্তার সময়ে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলায় প্রথম মিউনিসি-প্যালিটী ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। তাঁহারই সময়ে নদীয়াতে প্রথম রেল পথ খোলা হয়।

নদীয়ার বিখ্যাত ব্যক্তিগণ

শ্রীচৈতন্যদেব—নদীয়ার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের পরম গৌরব শ্রীচৈতন্য। তিনি নবদ্বীপে ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। খুব ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার লেখাপড়ায় বেশ মন ছিল। ১১ বৎসর বয়সের সময়

তিনি ভালরূপে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার মেধাবী ছাত্র বলিয়া সুনাম ছিল। পরে তিনি নবদ্বীপে একটি টোল করেন। অল্প দিনের মধ্যে শিক্ষা দানে তাঁহার খ্যাতি হয়। ভারতবর্ষের অনেক স্থান হইতে এই নবীন পণ্ডিতের কাছে অনেক প্রবীণ পণ্ডিত পড়িতে ও অনেক বিষয় জানিতে আসিতেন। তিনি সাধু ব্যক্তির মত সব কাজ করিতেন। "জীবে দয়া ও নামে রুচি" ইহাই তাঁহার মন্ত্র ছিল। কি করিয়া তিনি দুরন্ত "জগাই মাধাই"কে বশ করিয়াছিলেন তাহা তোমরা শিক্ষক মহাশয়ের নিকট শুনিও। চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া জগতে এক নূতন জিনিস দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র—শ্রীচৈতন্যদেবের আগে শান্তিপুরে অদ্বৈতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত ফুলিয়া গ্রামের অধ্যাপক শান্তাচার্য্যের কাছে বেদ অধ্যয়ন করেন। পরে ভারতের সকল তীর্থ ঘুরিয়া শান্তিপুরে আসিয়া তিনি নানা সৎকার্য্য করিয়া দিন যাপন করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ফুল ফুটিলে তাহার বাস রোধ করে কে? শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের নামের গুণে দেশ বিদেশ হইতে অনেক ভক্ত ও সাধু শান্তিপুরে আসিতে লাগিলেন। এমন কি শ্রীচৈতন্যদেবও আকুল প্রাণে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পরে তিনি তাঁহার নিকট বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের সন্নিকট

বাব্‌লা গ্রামে তাঁহার সাধন ভজনের আশ্রম ছিল। তোমরা এই পবিত্র স্থান দেখিও।

কৃত্তিবাস—বাংলার আদি কবি কৃত্তিবাস রাণাঘাট-শান্তিপুর লাইনে ফুলিয়া ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেম। ইনি পবিত্র সংস্কৃত কাব্য **"রামায়ণ"** বাংলা পদ্যে লিখিয়া অমর হইয়াছেন। ১৩২২ সালে তাঁহার ভিটার উপর মর্ম্মরের একটি স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার উপর লেখা আছে :—

হেথা দ্বিজোত্তম,
আদি কবি বাংলার ভাষা রামায়ণকার
কৃত্তিবাস লভিলা জনম ;
সুরভিত সুকবিত্বে ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থে
হে পথিক, সম্ভ্রমে প্রণম।

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত—১২২৮ সালে কাঁচড়াপাড়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ১২৪৫ সালে ১লা আষাঢ় হইতে "প্রভাকর" নামে খবরের কাগজ বাহির করিয়াছিলেন। ইহাই বাংলা ভাষায় প্রথম দৈনিক পত্রিকা। ইনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন।

মদন মোহন তর্কলঙ্কার—১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বিল্বপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি কৃষ্ণনগর কলেজ ও কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক এবং পরে ডেপুটী

ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ছেলেমেয়েদের পাঠের বই "শিশু শিক্ষা" তাঁহার রচিত। তাঁহার এই বিখ্যাত কবিতা কে না পড়িয়াছে ?

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।"

অক্ষয় কুমার দত্ত—১২২৭ সালে চুপীগ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন। তিনি বহু পুস্তক লিখিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ "চারুপাঠ"। তাঁহারই রচনা। ইঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র ৺সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা-দেশের একজন বিখ্যাত কবি।

রায় বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র—১২৩৬ সালে চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন এই গ্রাম নদীয়ার মধ্যে ছিল। বর্ত্তমানে যশোহরের মধ্যে গিয়াছে। ইনি ডাক বিভাগে একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং একজন সুকবি ও সুলেখক ছিলেন। তাঁহার লিখিত "নীল দর্পণ" ও "সুরধনী কাব্য" বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়—১২৭৭ সালে কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের দেওয়ানের কার্য্য করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রায় মহাশয় সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। লেখক ও সুগায়ক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই বিদ্বান্ ছিলেন। তাঁহারই পুত্র কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

রামতনু লাহিড়ী—১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে জন্মাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি এতই মধুর ছিল যে সকলেই তাঁহাকে বিশেষরূপে সম্মান করিতেন। তাঁহার জীবনে তিনি এমন সব কাজ করিয়াছিলেন যাহা পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে অনেক ভাল কিছু শিক্ষা হয়। কলিকাতার বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা ৺এস, কে, লাহিড়ী তাঁহার পুত্র।

সেকালে এই সকল বিখ্যাত পণ্ডিতগণও নদীয়াতে ছিলেন—রঘুনাথ শিরোমণি, বুনো রামনাথ, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি। তাঁহারা এক এক জন এক এক বিষয়ে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। সমস্ত ভারতের পণ্ডিতগণ তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিতে আসিতেন।

বীর আশানন্দ—ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে শান্তিপুরে জীবিত ছিলেন। তিনি ঢেঁকির সাহায্যে দস্যুদলকে সংহার করিয়া অসহায় নর নারীর সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই অবধি তাঁহার নাম হইয়াছিল 'আশানন্দ ঢেঁকি'। তাঁহার বীরত্বপূর্ণ জীবন কথা শুনিলে তোমাদের হৃদয় সতেজ হইবে এবং তোমরা আনন্দে আটখানা হইবে। ১৩৪০ সালে এই বীরের ঠাকুর বাড়ীর পার্শ্বে একটি সুদৃশ্য স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তাহার গায়ে খোদিত আছে—

"দুষ্টের দমনে আর শিষ্টের পালনে,
সুমহান্ ব্রত যাঁর ছিল এ জীবনে ;

আশানন্দ স্মৃতি-স্তম্ভ

মুখো- বংশে অবতীর্ণ আশানন্দ বীর,
"ঢেঁকি" নামে খ্যাত যিনি বক্ষে পৃথিবীর ;
প্রবাদ হয়েছে এবে গরিমা যাঁহার,
তাঁহার এ স্মৃতি স্তম্ভে কর নমস্কার।"

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস—১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর হইতে সাত ক্রোশ পশ্চিমে নাথপুর গ্রামে এক কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছেলেবেলা হইতেই সাহসী ছিলেন এবং ১৪ বৎসর বয়সে অপরিচিত সুদূর ইউরোপের
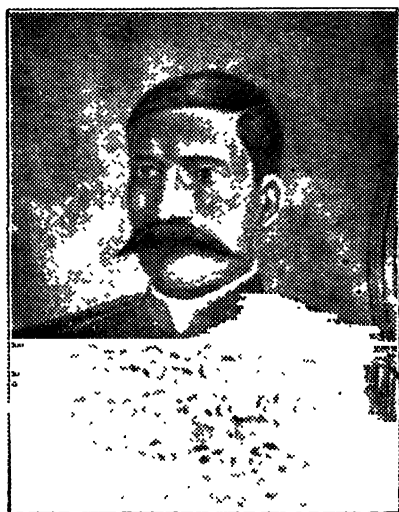
কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে মুটের ও ফেরিওয়ালার কাজ হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিয়া আমেরিকায় গিয়ছিলেন এবং সেখানে সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করিয়া বহু বীরত্বের কাজ করিয়াছিলেন। তিনি

মাত্র ৫০টি সৈন্য লইয়া নিক্কেরোয় সহর জয় করিয়াছিলেন। তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে আমেরিকায় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার স্ত্রী, দুই পুত্র এবং এক কন্যা আমেরিকায় আছেন। নদীয়াতে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার কথা হইতেছে। তাঁহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার "বঙ্গবীর সুরেশ বিশ্বাস" নামে ছোটদের জন্য একখানি বই রচনা করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে তোমাদের মনে সাহস হইবে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—নদীয়া জেলার শিকারপুরের নিকটবর্ত্তী দহকূল গ্রামে মাতুলালয়ে ১২৪৮ সালের ১৯শে শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি তাঁহার বাসস্থান শান্তিপুরে লেখা পড়া শেখেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা ভালরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং একজন ভক্ত ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পুরীতে তাঁহার সমাধি মন্দির আছে। সেখানে তিনি "জটীয়া বাবা" নামে বিখ্যাত।

দামোদর মুখোপাধ্যায়—শান্তিপুর-রত্ন সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ছিলেন। তাঁহার লিখিত বিরাট গ্রন্থ "ভাগবত গীতা" ও "দামোদর গ্রন্থাবলী" তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম বাবুর বিখ্যাত উপন্যাস রাজসিংহের উপসংহার লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ডি, এল, রায় নামে সুপরিচিত। তিনি এম, এ, পাশ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন। তাঁহার লেখা অনেক বই

ও হাসির গান আছে। তাহা ছাড়া তাঁহার রচিত এই সুপরিচিত গান দুইটি তোমরা বোধ হয় শুনিয়াছ এবং কেহ কেহ গানও করিয়াছ। তোমরা বড় হইলে এই গান দুইটি মুখস্থ করিও।

(১) 'ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।'

(২) 'বঙ্গ আমার জননী আমার স্বর্গ আমার আমার দেশ।'

মোজাম্মেল হক—ইঁহার বাড়ী ছিল শান্তিপুরে। তিনি স্থানীয় জুবিলী মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বহুদিন যাবৎ উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তিনি অবসর সময়ে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য ও সাহিত্য সেবা

মোজাম্মেল হক

করিতেন। তিনি একজন স্বভাব কবি ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার লিখিত বহু বই বিদ্যালয়ে পড়ান হয়। ১৯৩৩ সালে

৩০শে নভেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন! নদীয়া-গৌরব মাননীয় খান বাহাদুর এম, আজিজুল হক্ সাহেব তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র।

সার অতুল চাটার্জি—১৮৭৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে নিজ পল্লী শান্তিপুরে লেখা পড়া শিখিয়া পরে কলিকাতার হেয়ার স্কুল হইতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষার পাশ করেন। তিনি এম, এ পড়িবার সময় সরকারী বৃত্তি লইয়া বিলাত যান এবং সেখানে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আই, সি, এস, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহার পর তিনি ভারতের নানা স্থানে উচ্চ সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং ১৯২২ সালে বিলাতে ভারতের হাই কমিশনার হন। এখন তিনি বিলাতে আছেন। এত বড় রাজ কর্ম্মচারী নদীয়ায় বর্ত্তমানে আর কেহ নাই।

রায় বাহাদুর জলধর সেন—নদীয়া জেলার কুমার-খালি গ্রামে ইহার বাসস্থান ছিল। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার "ভ্রমণ কাহিনী"র বইগুলি বিখ্যাত। তিনি আজীবন সাহিত্য সেবা করিয়া ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তোমরা বড় হইয়া তাঁহার সব বইগুলি পড়িলে খুবই আনন্দ পাইবে।

খান বাহাদুর এম, আজিজুল হক, সি, আই, ই—শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি

বর্ত্তমানে নদীয়ার একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আজিজুল হক সাহেব কিছুকাল বাংলা দেশের শিক্ষা-মন্ত্রী ছিলেন। উপস্থিত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 'স্পীকারের' পদ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। মাননীয় হক্ সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যান্সালার।

স্বামী মাধবানন্দজী

স্বামী মাধবানন্দজী (নির্ম্মল মহারাজ)—১৮৮৮-সালে ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১০-

সালে এম, এ, পড়িতে পড়িতে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন। তাহার কিছুকাল পরে তিনি হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে 'মায়াবতী আশ্রমে' নয় বৎসর পাঠ ও সাধন ভজনে কাটান। ১৯২৭খৃষ্টাব্দে তিনি দুই বৎসরের জন্য আমেরিকা ও ইউরোপে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রেরিত হন। এখন তিনি বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক; স্বামীজী কতকগুলি মূল্যবান ধর্ম্ম পুস্তকের ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়া ভারতবর্ষে ও তাহার বাহিরে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা স্বামী দয়ানন্দ (বিমল মহারাজ) রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সন্ন্যাসী।

ব্যায়ামাচার্য্য শ্যামসুন্দর গোস্বামী—শান্তিপুরে তাঁহার বাড়ী। ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর রোগা ছিল। নিয়মিতরূপে ব্যায়ামের ফলে তিনি এখন সুন্দর স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন। তিনি আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম কৌশলে যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছেন। আমেরিকার স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে 'ডক্টর' উপাধি দিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্যায়াম প্রণালী ও স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল জগতে অভিনব বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

তোমরা ছেলেবেলা হইতে নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিলে তোমাদের জেলার এই সুবিখ্যাত বীর ছেলের মত সুন্দর স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিব। এই ছবি তিনি গত বৎসর

আমেরিকায় তুলিয়াছিলেন। এই ছবিতে তিনি এক প্যাকেট তাস ছিঁড়িয়া বত্রিশ ভাগ করিতেছেন। তাঁহার গায়ে কি ভয়ঙ্কর জোর!

ব্যায়ামাচার্য্য শ্যামসুন্দর গোস্বামী

কিশোরীমোহন বাগ্‌চি—ইনি বিখ্যাত পি, এম, বাগ্‌চি এণ্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। এই কোম্পানীর লিখিবার কালী বাংলাদেশে বিখ্যাত। ইনি শান্তিপুরের লোক ছিলেন। ছোটবেলা হইতে ব্যবসায়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি প্রথমে কালী প্রস্তুত করিয়া

অর্থ উপার্জ্জন করেন; তাহার পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বৃহৎ ছাপাখানা করেন। তাঁহাদের বৃহৎ পঞ্জিকা এখন সমগ্র ভারতে আদৃত হইয়াছে।

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র—এম. এ, বি, এল, এম, এল, এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ। তাঁহার বাড়ী শান্তিপুরে। ইনি নদীয়া জেলায় সুপরিচিত। কয়েক বৎসর হইতে ইনি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সভ্যরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি একজন সুবক্তা। শান্তিপুরস্থ বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদের সম্পাদকরূপে ইনি তাহার অনেক উন্নতি করিয়াছেন।

নদীয়া জেলার বহু ব্যক্তিই নানা বিষয়ে প্রতিভা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। সকলের কথা বলিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। উপরে যাঁহাদের কথা বলা হইল তাহা ছাড়া আরও কয়েক জনের নাম উল্লেখযোগ্য—কলিকাতার সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ৺হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, সুসাহিত্যিক ৺অক্ষয় কুমার মৈত্র, সি, আই, ই; নবদ্বীপের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ৺সতীশ চন্দ্র আচার্য্য, কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি মাননীয় বিজন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়; কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী লাহিনীপাড়ার "বিষাদসিন্ধু" প্রণেতা ৺মীর মোশারফ হোসেন, শান্তিপুরের পণ্ডিত নলিনীমোহন সান্যাল, এম, এ ভাষাতত্ত্বরত্ন, অবসর প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পরিদর্শক, কলিকাতা আইন

কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ৺ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচি, এল, এল, ডি, (ডবলিন); প্রবীণ সুবিখ্যাত কবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, উলার বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীরাজশেখর বসু, মেহেরপুরের প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়, কৃষ্ণনগরের ৺মনমোহন ঘোষ বার-এট-ল, সুগায়ক শ্রীদিলীপ কুমার রায় (৺কবি ডি, এল, রায়ের পুত্র) ইত্যাদি।

এই গ্রন্থকার প্রণীত ছোটদের দুইখানি ভাল বই :—(১) **'বীর আশানন্দ'** মহামান্য ডি. পি. আই মহোদয় কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর পুস্তকরূপে অনুমোদিত। ৩য় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। দাম ॥০ আট আনা। (২) **'বঙ্গবীর সুরেশ বিশ্বাস'**—দাম ।⁄০ পাঁচ আনা। (৩) **'বীর আশানন্দ ঢেঁকি'** স্ত্রী চরিত্র বর্জ্জিত একাঙ্ক নাটক লেখা হইতেছে।

প্রতিদিন প্রভাতে যে দুঃসাহসিক কর্ম্ম কলাপের স্বপ্ন দেখিয়া শিশুরা জাগিয়া উঠে বাস্তবে তাহার সাফল্যের সম্ভাবনার পরিচয় তাহারা এই চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী বই দুইখানিতে পাইবে। ইহা পাঠে তাহাদের হৃদয় সতেজ হইবে।

নদীয়ার বর্ত্তমান মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস. কে. দে আই. সি. এস বই দুইখানি সম্বন্ধে বলেন :—* * These two books which should make interesting and inspiring reading, particularly to the people of Nadia district.

নদীয়ার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ও সুসাহিত্যিক মিঃ এ. এস. রায় I. C. S. বলেন :—"বীর আশানন্দ" পড়ে আমি সত্যি সুখী হয়েছি। আমাদের ছোটদের হাতে যে সব বই দেওয়া হয় তার অনেকগুলিতে থাকে ফাঁকীর সুখ্যাতি, ডাকাতির গুণগান এবং ভূতপ্রেতের বিভীষিকা। আপনি এমন একজন মানুষের কাহিনী দিলেন যিনি অরাজকতার দিনে দুর্জ্জনের যম ছিলেন, আর স্বয়ং ছিলেন নিঃস্বার্থ ও নিষ্কলুষ।

আপনারা প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য নদীয়ার এই বীর সন্তানদ্বয়ের অপূর্ব্ব জীবন কথা কিনিতে ভুলিবেন না। নদীয়ার সকল স্কুলে ইহা থাকা চাই-ই।